

বাংলাদেশের দারিদ্র : অতীত ও বর্তমান সমস্যা ও সমাধান

হীরালাল বাল্লা*

ভূমিকা

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, প্রাচীন (খ্রী: পূ: ৩২৬ অব্দ-১২০৩ খ্রী:) ও মধ্যযুগে (১২০৩-১৭৫৭) বাংলাদেশ ধন-ধান্যে-পুষ্পেভরা একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার দেশ ছিল। তৎকালে এ দেশ কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। এ সকল কারণে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার এতটা উন্নতি হয়েছিল যে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা ও প্রাচুর্যের বাংলা। ঐতিহাসিকদের এই অভিমত তৎকালে প্রাপ্ত লেখমালা, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল উপাদানে অতিরঞ্জন, কল্পনা ও ভাবাবেগের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। সে জন্য সত্যিকার ইতিহাস নির্মাণে অনেক সময় অসুবিধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস নির্মিত হয়েছে এ সকল উপাদানকে নির্ভর ও আশ্রয় করে। অবশ্য এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে যারা ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের গ্রন্থে বাংলার যথার্থ ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও সমৃদ্ধি একটি অতিকথন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশকে সোনার বাংলা এবং প্রাচুর্যের বাংলায় অভিহিত করার পেছনে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, এ সময়ে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা ভোগ করেছে। দ্বিতীয়ত, তখন দেশটি ছিল ‘প্রাচুর্য ও সম্ভার দেশ’। তৃতীয়ত, এ অর্থনীতির সুবিধেভোগীরা কখনোই দারিদ্রের শিকার হয়নি। চতুর্থত, সমসাময়িক অন্যান্য সমাজের তুলনায় এ সময়ে বাঙালী সমাজ বেশী সমৃদ্ধ ছিল।^১

উপরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ও প্রাচুর্যের সপক্ষে যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তা সকল ঐতিহাসিকের অভিমত বা অভিপ্রেত নয়। ‘বাঙালীর ইতিহাস’ (আদিপর্ব) প্রণেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার-এর নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ডঃ রায় যদিও তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার সুখ ও সমৃদ্ধির চিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এঁকেছেন কিন্তু তিনি এও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সমাজের নিম্নস্তরে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ সেকালেও দারিদ্র প্রপীড়িত ছিল। ডঃ মজুমদার তার ‘বাংলার ইতিহাস’ (আধুনিক যুগ)-এ একস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানের তুলনায় স্বল্পমূল্য দেখে কেউ যদি মনে করেন যে, শত বছর পূর্বে

* পরিচালক, ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

১। আকবর আলী খান : সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ৫৮৫।

বাংলায় রামরাজ্য ছিল, লোকে মহাসুখে জীবন ধারণ করত, তাহলে তিনি বিষম ভুল করবেন। কারণ তখন শ্রমের মূল্যও ছিল অনেক কম। বলাবাহুল্য ডঃ মজুমদার বৃটিশ আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার দাসপ্রথা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ আবদুর রহিম বলেছেন যে, দারিদ্রের কারণে সে সময় (মধ্যযুগ) ছেলেদের খোজা করে বিক্রয় করা হতো।^২

বাংলার অর্থনীতি সব সময়ই কৃষি নির্ভর ছিল। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি শিল্প নির্ভর অর্থনীতি অপেক্ষা যে অনুন্নত তা আজ দিবালোকের মত সত্য। কি কি কারণে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত তাও আজ নিরূপিত। পৃথিবীর কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সেখানে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, মজুরির নিম্নহার, বেকারত্ব ও ক্রয় ক্ষমতার অনুপস্থিতি, সম্পদ সঞ্চালনে ও মূলধন গঠনে ধীরগতি প্রভৃতি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির ও সমাজের উপসর্গ বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে কার্ল মার্কস এ কথা বলেছিলেন বহুপূর্বে। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল, ভারতীয় জীবন “অশালীন, স্থবির ও তার জনসংখ্যা বর্ধনশীল”। গ্রামীণ সমাজকে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র, আধা-বর্বর ও আধা-সভ্য।

মেক্সিম গোর্কির ভাষায়, কৃষকরা সর্বত্র সমান। যে কোন মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ প্রায় একমত যে, কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমের মূল্য যথেষ্ট নয়, উৎপাদন স্থিতিশীল নয়, উৎপাদিত ফসল সমভাবে বন্টিত হয় না, ভূমির মালিকানা স্বত্ব সবার সমান নয়, উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্য পায় না, বেকারত্ব থাকে, আয় বন্টনে বৈষম্য বিরাজ করে।

এ সব স্বীকার করে নিলে অবশ্যই মেনে নিতে হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় দারিদ্র ছিল, দারিদ্রের কারণও ছিল। এ দারিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও পেশাজীবী প্রভৃতি সকল স্তরের ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছিল। শ্রমজীবী ও পেশাজীবীরা যে দারিদ্রের শিকার হয়েছিল এরূপ নজির প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে এখানে-সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অনেকের মতে বাংলাদেশ শুধু কৃষি নির্ভর ছিল না, সেখানে শিল্পদ্রব্যেরও যথেষ্ট উৎপাদন ছিল। বাংলাদেশের রেশম ও সুতী বস্ত্র, চিনি, লবণ, পান, সুপারি, গুড়, নানা প্রকার মশলা, হীরে-মুক্তা প্রভৃতি অনেক কিছুই যথেষ্ট উৎপাদিত হতো এবং বিদেশেও তা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হতো। সে সুবাদে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা-রূপা ও টাকা-পয়সা আসতো। এ ব্যবসা-বাণিজ্যে এদেশের বহু লোক ধনীও বনে গিয়েছিল। সত্য বটে, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, শিল্পোৎপাদন ছিল, বিদেশ থেকে সোনা-রূপা, টাকা-পয়সার আমদানীও ছিল। কিন্তু তা সমাজের সকল স্তরের ও শ্রেণীর মানুষের নিকট কোনদিনই সমভাবে পৌঁছেনি। শ্রমিক ও মজুর সবদিনই বঞ্চিত হয়েছে।

২। বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিত দেখুন গ্রন্থপঞ্জির ১ নং ক্রমিকের পৃ: ১৫২-১৯৯, মধ্য ও আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাদেখুন ৩ নং ক্রমিকের পৃ: ৩৫৭-৩৯০, ৪ ও ৫ নং ক্রমিকের পৃ: ৪৩৭-৪৬৯, পৃ: ৪৮১-৫১৯, ৬নং ক্রমিকের পৃ: ২১৬-২২৯ এবং ৮ নং ক্রমিকের সমগ্র পুস্তকখানি।

এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা ভোগ করেছে এবং এ ধারা ছিল নিরন্তর ও নিরবধি ; তাহলে এও ধরে নিতে হয় যে, বাংলাদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি, মানুষ ভাতের অভাব, বস্ত্রের অভাব ও বাসস্থানের অভাবের সম্মুখীন হয়নি। অথচ এ যুগের ইতিহাস কম করে হলেও চারটি দুর্ভিক্ষের বার্তা বয়ে এনেছে। প্রথম দুর্ভিক্ষটি সংঘটিত হয়েছিল পুণ্ডনগরে (বর্তমান বগুড়া) খ্রী: পূ: তৃতীয়/দ্বিতীয় শতকে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল গৌড়ের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে ৯ম শতকে, তৃতীয়টি ঘটেছিল নবদ্বীপ বা তৎসংলগ্ন এলাকায় যার উল্লেখ বন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' (১৫৩৮) কাব্যে পাওয়া যায়, চতুর্থ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৬৬১-৬৩ সালে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দুর্ভিক্ষ দু'টি ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। প্রথমটি প্রাকৃতিক কারণে ঘটেছিল। শেষোক্ত দুর্ভিক্ষে খাদ্য-শস্যের মূল্য বাড়ার কারণ ছিল খাদ্য-শস্যের অপরিপাকতা নয় বরং নানা বিপদসংকুল পরিবেশ ও মালামাল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত হবার কারণে। রুটির চেয়ে তখন জীবন সস্তা হয়ে গিয়েছিল। রুটি পাওয়াই যেত না।^৩

মুদ্রা ব্যবস্থা

প্রাচীন যুগে গুপ্ত আমলে ও তার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেন ও পাল আমলে স্বর্ণমুদ্রা প্রথমে ওজনে কম ও নকল হয় এবং পরে তাও উধাও হয়। এ সময়ে কড়িই একমাত্র কেনা-বেচার মাধ্যম ছিল। এমনকি সারা মধ্যযুগে কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যদিও এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এদেশে এসেছিল। কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির এত ব্যাপক ব্যবহার উন্নত অর্থনীতির দ্যোতক নয়।

সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী

দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতকে রচিত বৃহদধর্ম পুরাণে ৪১টি বর্ণের/পেশার মানুষের উল্লেখ আছে।^৪ এ সকল পেশাজীবী মানুষের অধিকাংশের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৩৮ সালে রচিত বন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'। সুতরাং বলা চলে যে, বাংলাদেশের এই বর্ণ/পেশা ভিত্তিক সমাজ বহুদিন চলে আসছিল। শ্রেণী/পেশা ভিত্তিক সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ যে সচ্ছল ছিল না তা আজকের দিনে ঐ শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়।

৩। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, দি হিস্টরি অব বেঙ্গল, খণ্ড ২ (পাটনা, ১৯৭৩), পৃ: ৩৪৪।

৪। নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, কলিকাতা, সাফরতা প্রকাশন, পৃ: ২৯১-৩০৩।

দাস প্রথা

প্রাচীনকাল হতে এদেশে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা মধ্যযুগে ও ব্রিটিশ আমলের প্রথমার্ধে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ডঃ আকবর আলী খান ১৬৯৫-১৭৫৪ সালের মানুষ বিক্রির কিছু দলিল থেকে ৬ জন দাস-দাসী বিক্রির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।^৫ এ সব দাস-দাসী বিক্রি হয়েছে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টজনিত কারণে। মন্টেগোমারী মার্টিন ১৮৬২ সালে দাস-দাসী বিক্রয়ের যে বিবরণ দেন তা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রদত্ত হল ৬:

স্থান	দাস-দাসীর সংখ্যা
রংপুর	৫,৩৬,১৪০
রাজশাহী	৭,৬৬,৩৪১
ঢাকা, জামালপুর	২,৭৫,১৯০
চট্টগ্রাম	১,৭৫,২০০
সিলেট	৩,৬১,২৪০
ময়মনসিংহ	৩,৬৩,৬৭৭

উপরের বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের দাস প্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে সমাজে দারিদ্র কতটা ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল। এরপর ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস কম-বেশী সকল শিক্ষিত মানুষের জানা। কিভাবে ইংরেজ এ দেশের হস্তশিল্প, কারুশিল্প ও তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করেছে, এ দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বিলেতে পাচার করেছে, এ দেশের মাটিতে বিলেতি পণ্যের বাজার সৃষ্টি করেছে; এ দেশের অর্থে বিলেতে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে; সে ইতিহাস অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইংরেজের বাণিজ্য, শুল্ক ও রাজস্ব নীতির ফলে এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী মার খেয়েছে, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। জনগণ অর্থকষ্টে ও অন্নকষ্টে পড়েছে। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যে সকল শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছিল তার অধিকাংশ পড়েছিল কলকাতার আশে-পাশে। বর্তমান বাংলাদেশের ভাগে পড়েছিল ৩টি চিনির কল, ৫টি কাপড়ের কল, ১০টি জুট বেইলিং প্রেস এবং একটি সিমেন্ট কারখানা। অর্থাৎ এ অঞ্চলটি তখন পুরোপুরি কৃষি নির্ভর ছিল।

পাকিস্তান আমলের বঞ্চনা ইংরেজের বঞ্চনার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এ বঞ্চনা ছিল অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে। এ দেশের রাজস্ব ও বাণিজ্য থেকে আহৃত অর্থের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হয়। ফলে বাংলাদেশ থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।* প্রাপ্ত

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন : গাজীউল হক প্রণীত “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, পুথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ২৪-৩৩ পৃষ্ঠা।

৫। আকবর আলী খান : সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব, প্রাগুক্ত পৃ: ৬০১।

৬। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন D. R. Banarji, *Slavery in British India*, Bombay, Kitabmahal. 1933.

বৈদেশিক সাহায্যের বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়। ফলে এই সীমাহীন শোষণ ও বঞ্চনার ফলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের বিশ্লেষণ

পূর্বের আলোচনায় বাংলাদেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় সে সময়কালে বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে কিছু ধারণা ও তথ্য পাওয়া যায়। যতদূর জানা ও বোঝা যায় তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে সমাজে দরিদ্র মানুষ ছিল, দেশের অর্থনীতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। সেকালেও শোষণ ও বঞ্চনা ছিল। সমাজের একটি অংশ চরম দারিদ্রের শিকার হয়েছিল।

বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এ সম্পর্কিত গবেষণা ও জরিপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া দরকার। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বি আই ডি এস) এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা/জরিপ পরিচালনা করেছে। বিশ্ব ব্যাংক, বিবিএস, আইএলও, ফাও, আই এম এফ প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণা/জরিপ থেকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ইদানীং দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এ সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

জনসাঁধারণের ওপর গবেষণা/জরিপে বাংলাদেশের দারিদ্রের চিত্র সারণি ১-৭ এ-
প্রদর্শিত হল :

সারণি - ১ বাংলাদেশের দারিদ্রের চিত্র

বছর	দরিদ্র জনগণের শতকরা হার	
	ফাও-এর সুপারিশ অনুযায়ী ২৩৩২ কি: ক্যা: (ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা)	আহমদ ও হোসেন-এর সুপারিশ মতে ২০৮৭ কি: ক্যা: (ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা)
১৯৬৩-৬৪	৭৫%	৫২%
১৯৭৭-৭৮	৪৮.৬%	৬৭.৯%

উপরের তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৩-৬৪ সালের দারিদ্র অবস্থা ১৯৭৭-৭৮ সালে অনেক হ্রাস পায়। কিন্তু আহমদ ও হোসেনের জরিপ অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সালের ৫২%

দারিদ্র বেড়ে ১৯৭৭-৭৮ সালে ৬৭.৯%তে উপনীত হয়। দারিদ্র সম্পর্কে এখানে দু'টি ভিন্নধর্মী চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে দারিদ্র হ্রাসের ও অন্যদিকে দারিদ্র বৃদ্ধির প্রবণতা।

সারণি - ২

দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি

	অনপেক্ষ দারিদ্র		চরম দারিদ্র	
বছর (আর্থিক)	২২০০ কি: ক্যা:/ব্যক্তি/দিন		১৮০০ কি : ক্যা : ব্যক্তি/দিন	
	শহর	পল্লী	শহর	পল্লী

ক. দারিদ্র রেখার নিম্ন আয়ের জনসংখ্যার অনুপাত :

অর্থ বছর '৭৪	৬২.৫০	৬৫.২৭	৪৬.৮২	৪৯.৬৭
অর্থ বছর '৮২	৫০.৬৬	৭৯.১২	৩৫.৪৫	৬৬.৪৪
অর্থ বছর '৮৪	৩৯.৫২	৪৯.৮১	২৪.৮৩	৩২.০২
অর্থ বছর '৮৬	২৯.১১	৪৭.০৮	১৬.০৫	২৮.৩৬

খ. দারিদ্র মানুষের সংখ্যা (মিলিয়ন) :

অর্থ বছর '৭৪	৩.৯	৪১.৩৮	২.৮৮	২৮.৬৭
অর্থ বছর '৮২	৬.০১	৫৭.৯২	৪.২০	৪৮.৬৩
অর্থ বছর '৮৪	৪.২৬	৪১.০৫	২.৬৮	২৬.৩৯
অর্থ বছর '৮৬	৩.৬৬	৪১.০১	২.০২	২৪.৭১

সারণি - ৩

দারিদ্র সীমা ও দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি

বছর	দারিদ্র সীমারেখা (টাকার অঙ্কে বার্ষিক মাথাপিছু ন্যূনতম ব্যয়)		দারিদ্র সীমার নিম্নের জনসংখ্যার শতকরা হার	
	শহর	পল্লী	শহর	পল্লী
১৯৭৩-৭৪	১,৪৩৮	১,১০০	৭৬.৪	৭৭.৩
১৯৮১-৮২	৩,২৫৩	২,৬০২	৫৫.৬	৭৭.৮
১৯৮৩-৮৪	৩,৯৬০	৩,১৬৮	৪৮.৬	৫২.১
১৯৮৫-৮৬	৪,৯৪১	৩,৯৫৩	৩৯.২	৪৯.৯

সূত্র : মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮।

সারণি - ৪
বিশ্ব ব্যাংকের দারিদ্র সমীক্ষা

	দারিদ্র সীমা - ১		দারিদ্র সীমা - ২	
অর্থ বছর	২১২২ কি: ক্যা:/ব্যক্তি/দিন		১৮০৫ কি : ক্যা : ব্যক্তি/দিন	
	শহর	পল্লী	শহর	পল্লী
অর্থ বছর '৭৪	৮১.৪	৮২.৯	২৮.৬	৪৪.৩
অর্থ বছর '৮২ (ক)	৬৯.০	৯০.০	৩০.৭	৬৬.০০
অর্থ বছর '৮২ (খ)	৬৬.০	৭৩.৮	৩০.৭	৫২.২

নোট : ক. ১৯৭৩-৭৪ সালের খানা ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত ভোগের ধারা ভিত্তি করে;
খ. ১৯৮১-৮২ সালের খানা ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত ভোগের ধারা ভিত্তি করে।

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৮৭।

সারণি - ৫
জাতীয় আয় পরিমাপ ও খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত আয় পরিমাপের তুলনা

	জিএনপি কারেন্ট ফ্যাক্টর কন্ট (মিলিয়ন টাকা)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জাতীয় আয় পরিমাপ থেকে মাথাপিছু আয় (টাকা/মাস)	খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয় (টাকা/মাস)	৩ এর শতাংশ হিসেবে ৪
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অর্থ বছর '৭৪	৬৬৪৮২	৭৬.৪০	৮৭০	৯৭৭	১১২
অর্থ বছর '৭৭	১০০২৯৯	৮১.৮৫	১২২৫	১৪৮৩	১২১
অর্থ বছর '৮২	২৫৭০৯৭	৯০.৯৩	২৮২৭	২৫২০	৮৯
অর্থ বছর '৮৪	৩৪৩২২২	৯৫.২০	৩৬৩২	৪০২৯	১১২
অর্থ বছর '৮৬	৪৪৮১৫০	৯৯.৫৫	৪৫৫৯	৫২৫৯	১১৭

সারণি - ৬

আয় বন্টনে জিনিসূচক (১৯৭৩-৮৬)

	শহর		পল্লী	
	মাথাপিছু আয়	খানা প্রতি আয়	মাথাপিছু আয়	খানা প্রতি আয়
অর্থ বছর '৭৩-৭৪	০.৩২৩	০.৩৮৮	০.২৯৬	০.৩৯২
অর্থ বছর '৮১-৮২	০.৩৪৪	০.৪১৭	০.২৭১	০.৩৬০
অর্থ বছর '৮৩-৮৪	০.২৯১	০.৩৬৪	০.২৭১	০.৩৪৪
অর্থ বছর '৮৫-৮৬	০.৩১৫	০.৩৬৪	০.২৯২	০.৩৬৮

সূত্র : মাহবুব হোসেন (মে, ১৯৮৮)।

সারণি - ৭

বিভিন্ন বিভাজিত শ্রেণীর খানা প্রতি প্রকৃত আয়

১৯৬৩-৬৪ বার্ষিক টাকা মূল্যে

বিভাজিত শ্রেণী	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৬-৭৭	১৯৮১-৮২	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬
পল্লী					
উর্ধ্বের ৫ শতাংশ	৪২৯৮	৭০৮৩	৫৪৭২	৭৩৩০	৯৬২৬
উর্ধ্বের ১০ শতাংশ	৩৪১৯	৪৭১৫	৪২৫৪	৫৪৫৫	৬৮৮২
উর্ধ্বের ১৫ শতাংশ	২৯৭৯	৩৮২৮	৩৬২৬	৪৬২০	৫৬০৪
নিম্নের ৮৫ শতাংশ	১০০৩	৯১০	১১৯০	১৪৪৬	১৬৩২
নিম্নের ৪০ শতাংশ	৬৩৪	—	৮২৫	৮৯২	১০৮৫
শহর					
উর্ধ্বের ৫ শতাংশ	৮৩০৮	১৬৪৬৫	১২৩৩৪	৭৩৫৪	১১৫২১
উর্ধ্বের ১০ শতাংশ	৬৩২১	১০৯৯০	৯৭৩১	৬৪৪১	১০২১৯
উর্ধ্বের ১৫ শতাংশ	৫৬৩৮	৮৩৭২	৮১৬৬	৬১০২	৯০২২
উর্ধ্বের ৮৫ শতাংশ	১৫৯০	১৩৩৯	১৯৬৮	২০২৮	২৬৪৪
নিম্নের ৪০ শতাংশ	৯৫৪	—	১১৫৭	১২২৮	১৬৮১

সূত্র : আতিক রহমান এবং তৃণা হক (মে, ১৯৮৮)।

সারণি ২, ৩ ও ৪ পর্যালোচনান্তে দারিদ্র অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রে দেখা যায়, ১৯৮১-৮২ সালে ১৯৭৪ সালের পর্যায় থেকে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা

অধিক। তবে ১৯৮২ সালের পর থেকে গ্রামীণ ও শহরের দারিদ্র হ্রাসের বিষয়টি প্রকটভাবে নজরে পড়ে যা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা সম্পর্কে এ সকল তথ্য যদি যথার্থ হয়, তাহলে স্বভাবত প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, এ সময়কালে এমন কি ঘটেছিল যেজন্য দারিদ্র হ্রাস পেল; নাকি তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে দারিদ্র হ্রাসের চিত্রটি এভাবে ফুটে উঠেছে। ধারণা করা হয় যে, ১৯৮৪ সালে খানা ব্যয় জরিপ পদ্ধতির যে পরিবর্তন করা হয় সে জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণে এমনটি ঘটেছে। উপরন্তু জাতীয় আয় পরিমাপের ফলাফল এবং খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয়ের ফলাফলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (৫ নং সারণি)। বিশেষ করে ১৯৮২ সালের খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয়ের নিম্নহার এবং অন্যান্য বছরের উচ্চহারের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতি হ্রাসের হিসেব থেকে যদি কিছু কাট-ছাঁট করা হয় তারপরও যে অবস্থা দাঁড়ায় তাতে সামান্য হলেও দারিদ্র হ্রাসের কিছুটা ইজ্জত পাওয়া যায়।

অন্যমতে সত্তরের দশকে বাংলাদেশে দারিদ্রের আশংকাজনক অবনতি ঘটে, আশির দশকে কিছুটা উন্নতি হয়, কিন্তু তারপর থেকে দারিদ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি গবেষণামতে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা ১৯৬৩-৬৪ সালে ৪০.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭৫ সালে ৬১.৮ শতাংশ হয়।^৭ এ তথ্য সমর্থিত হয় কিউ, কে, আহমদ এবং এম, হোসেন (১৯৮৫) এর গবেষণায় যেখানে তাঁরা বলেন যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে অনপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৫২ শতাংশ।^৮ ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ৪৪ মিলিয়ন (৫১ শতাংশ) এবং শহরাঞ্চলে ৭ মিলিয়ন (৫৬ শতাংশ) মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে গ্রামীণ খানার ৪৩ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত ছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে খানা আয় তথ্য অনুসারে ৫৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র ছিল।^৯

আতিক রহমান এবং তৃণা হকের (১৯৮৮) মতে ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮১-৮২ সালে দারিদ্র বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক ও বিবিএস সূত্রে এ সময়ে দারিদ্র হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়। আতিক রহমান ও তৃণা হকের (১৯৮৮) সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ১৯৮১-৮২ সালে খানা আয় অত্যন্ত নিম্নহার নির্ণয়ের কারণেই গৃহীত হয়। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক ও বিবিএস-এর অনুসৃত পদ্ধতি ১৯৮১-৮২ সালে খানা ব্যয় জরিপ পদ্ধতির সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত নয় যা তাদের ফলাফলকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্য এ দুটি সূত্রের

৭। For Details see

A. R. Khan (1977), *Poverty and Inequality in Rural Bangladesh, Poverty and Landlessness in Rural Asia*, ILO, Geneva.

৮। For further detail see

Mustafa A. Rahman, et. al, *Grameen Bank in Employment Creation & Poverty Alleviation*, BPATC, Savar, Dhaka, August, 1993.

৯। See Executive summary (page II) of Hossain Zillur Rahman ed. (1992) : *Analysis of Poverty Trends Project, Rethinking Rural Poverty : A Case for Bangladesh*, BIDS, Dhaka.

তথ্যের ভিত্তিতে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা সম্পর্কে মতামতের গ্রহণযোগ্যতা অধিক। কিন্তু তাদের পদ্ধতিও আয় জরিপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্ত নয়।

এমতাবস্থায়, কোন বিশেষ অর্থ বছরে বা সময়ে দারিদ্র বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল তা নির্ণয় করা আসলে কঠিন কাজ। তবুও উপরের বিশ্লেষণে যা নির্দেশ করে তাহল সত্তরের দশকে দারিদ্র অবস্থার অবনতি ঘটে, কিন্তু আশির দশকে দারিদ্রের অবনতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত নয়। ওসমানী (১৯৯০) মনে করেন, এ সময় মাঝারি ধরনের দারিদ্র কমলেও সে সঙ্কে চরম দারিদ্র বেড়েছে। বছর নির্বাচন, নির্দিষ্ট অনুসৃত পদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি প্রভৃতির গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা এ ধরনের মূল্যায়নের একটা সর্বল দিক বলে এখানে দাবী করা হয়। এর সমর্থনে প্রথমে তাঁরা (ওসমানী ১৯৯০) যা বলেন তাহল ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে বার্ষিক মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ হারে কিন্তু এর বিপরীতে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে যৎসামান্য অর্থাৎ মাত্র ০.২ শতাংশ। এ অবস্থা খাদ্যের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বিরাট অসমতা প্রমাণ করে।^{১০}

এ অসমতা আয় বন্টনের বিরাট বৈষম্যের সঙ্কে সঙ্গতিপূর্ণ যার অর্থ হচ্ছে বাড়তি আয় শুধু অত্যন্ত ধনীদেই ধন বৃদ্ধি করেছে যাদের বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। অথবা এ সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশী বেড়েছে। কিন্তু বিবেচ্য সময়ে খাদ্য-শস্যের আপেক্ষিক মূল্য বাড়েনি। যেমনটি বেড়েছিল স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।^{১১} এতে অনুমিত হয় আয় বন্টনে দারুণ বিপর্যয়ের ফলে খাদ্য-শস্যের চাহিদা চেপে রেখেছিল। যদিও খানা ব্যয় জরিপ তথ্য আয় বন্টনের বিশেষ বৈষম্য নির্দেশ করে না ; কিন্তু সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্র থেকে ধরা পড়ে যে এ বর্ধিত আয় কেবল ধনীদের সম্পদ বর্ধনে যোগ হয়েছে যাদের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেক আগেই মিটে গেছে।^{১২} এটাও অনেকটা সত্য যে, এসব খানার ছদ্ম আবরণে আয়ের চেহারাটা ঢাকা পড়ে তজ্জন্য তাদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সহজ হয় না। খানা আয়-ব্যয় জরিপের প্রাপ্ত চিত্র যাইহোক এটা অনুমান করা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে আয় বৃদ্ধি গরিবের জন্য হয়নি ; বরং তা তেলে মাথায় তেল দেয়ার সামিল হয়েছে।^{১৩}

আসলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্রের সঙ্কে সঙ্গতি রেখে সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হয়নি। দারিদ্রের সামগ্রিক উন্নতি হলে মাথাপিছু খাদ্য-চাহিদা এবং

১০। S. R. Osmani, Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh, in *Special Issue on Poverty in Bangladesh*, BIDS, Vol. XVIII, Number 3, September 1990, p. 86.

১১। ঐ পৃ: ৮৬।

১২। ঐ পৃ: ৮৬।

১৩। ঐ পৃ: ৮৬।

তথ্যের ভিত্তিতে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা সম্পর্কে মতামতের গ্রহণযোগ্যতা অধিক। কিন্তু তাদের পদ্ধতিও আয় জরিপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্ত নয়।

এমতাবস্থায়, কোন বিশেষ অর্থ বছরে বা সময়ে দারিদ্র বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল তা নির্ণয় করা আসলে কঠিন কাজ। তবুও উপরের বিশ্লেষণে যা নির্দেশ করে তাহল সত্তরের দশকে দারিদ্র অবস্থার অবনতি ঘটে, কিন্তু আশির দশকে দারিদ্রের অবনতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত নয়। ওসমানী (১৯৯০) মনে করেন, এ সময় মাঝারি ধরনের দারিদ্র কমলেও সে সত্ত্বগে চরম দারিদ্র বেড়েছে। বছর নির্বাচন, নির্দিষ্ট অনুসৃত পদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি প্রভৃতির গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা এ ধরনের মূল্যায়নের একটা সর্বল দিক বলে এখানে দাবী করা হয়। এর সমর্থনে প্রথমে তাঁরা (ওসমানী ১৯৯০) যা বলেন তাহল ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে বার্ষিক মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ হারে কিন্তু এর বিপরীতে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে যৎসামান্য অর্থাৎ মাত্র ০.২ শতাংশ। এ অবস্থা খাদ্যের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বিরাট অসমতা প্রমাণ করে।^{১০}

এ অসমতা আয় বন্টনের বিরাট বৈষম্যের সত্ত্বগে সত্ত্বগতিপূর্ণ যার অর্থ হচ্ছে বাড়তি আয় শুধু অত্যন্ত ধনীদেই ধন বৃদ্ধি করেছে যাদের বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। অথবা এ সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশী বেড়েছে। কিন্তু বিবেচ্য সময়ে খাদ্য-শস্যের আপেক্ষিক মূল্য বাড়েনি। যেমনটি বেড়েছিল স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সত্ত্বগে সত্ত্বগতিপূর্ণ ছিল।^{১১} এতে অনুমিত হয় আয় বন্টনে দারুণ বিপর্যয়ের ফলে খাদ্য-শস্যের চাহিদা চেপে রেখেছিল। যদিও খানা ব্যয় জরিপ তথ্য আয় বন্টনের বিশেষ বৈষম্য নির্দেশ করে না ; কিন্তু সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্র থেকে ধরা পড়ে যে এ বর্দ্ধিত আয় কেবল ধনীদে সম্পদ বর্ধনে যোগ হয়েছে যাদের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেক আগেই মিটে গেছে।^{১২} এটাও অনেকটা সত্য যে, এসব খানার ছদ্ম আবরণে আয়ের চেহারাটা ঢাকা পড়ে তত্ত্বজন্য তাদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সহজ হয় না। খানা আয়-ব্যয় জরিপের প্রাপ্ত চিত্র যাইহোক এটা অনুমান করা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে আয় বৃদ্ধি গরিবের জন্য হয়নি ; বরং তা তেলে মাথায় তেল দেয়ার সামিল হয়েছে।^{১৩}

আসলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্রের সত্ত্বগে সত্ত্বগতি রেখে সামষ্টিক দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হয়নি। দারিদ্রের সামষ্টিক উন্নতি হলে মাথাপিছু খাদ্য-চাহিদা এবং

১০। S. R. Osmani, Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh, in *Special Issue on Poverty in Bangladesh*, BIDS, Vol. XVIII, Number 3, September 1990, p. 86.

১১। ঐ পৃ: ৮৬।

১২। ঐ পৃ: ৮৬।

১৩। ঐ পৃ: ৮৬।

খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক মূল্যও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তা ঘটেনি। এরপরও যদি অনুমান করা হয় যে, কেউ কেউ দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছে, সেটিও তারা করেছে দারিদ্রদের দারিদ্রতর করে।^{১৪}

১৯৮৪-৮৫ সালে মুশাররফ হোসেন ও অন্যান্যরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬টি গ্রামে যে জরিপ চালান তাতে তাঁরা দেখতে পান যে, ঐ সময়ে পল্লীর দারিদ্র জনগণ গড়ে প্রতিদিন ১৪ আউন্সের চেয়ে কম খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। যদিও সরকারী হিসেবে সারা বাংলাদেশে এ পরিমাণ ছিল ১৬ আউন্স। শহরবাসী গ্রামবাসীর চেয়ে বেশী পরিমাণে শাক-শব্জী, ডাল-মাছ খায়। গ্রামের লোক শারীরিক ও দৈহিক পরিশ্রম বেশী করে। এজন্যে তাদের বেশী খাওয়ার প্রয়োজন হয়। এদিকে শহরের মানুষের খাদ্যশস্য কম লাগে। সমগ্র দেশের মানুষের চেয়ে গ্রামের মানুষের গড়ে কম খাদ্যশস্য গ্রহণ করাটাই দারিদ্রের সবচেয়ে বড় নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।^{১৫}

আয় বন্টনের বৈষম্যের মাত্রাও সমাজে দারিদ্রের উপস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। জাতীয় আয় বন্টন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'জিনি' সূচক দ্বারা চিহ্নিত হয়। উক্ত জিনি সূচক অনুসারে মাথাপিছু ও খানা প্রতি আয় বন্টনের চিত্রে মনে হয় যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে পল্লীর জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বন্টনে ১৯৭৩-৭৪ সালের চেয়ে উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ সালে তাতে আবার অবনতি ঘটে (সারণি-৬)। পল্লীর খানা প্রতি আয় বন্টন একই রূপ থাকে কিন্তু বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। শহরের মাথাপিছু আয় বন্টনে বৈষম্য ১৯৮১-৮২ সালে বৃদ্ধিপায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে হ্রাস পায় কিন্তু তা পুনরায় ১৯৮৫-৮৬ সালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শহরের খানা প্রতি আয় বন্টনের বৈষম্য ১৯৮১-৮২ সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ১৯৮৩-৮৪ সালে হ্রাস পায়, ১৯৮৫-৮৬ সালে অনুরূপ অবস্থায় থাকে (সারণি-৬)।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আয় বন্টনের বৈষম্য ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে বাড়ে, আশির দশকের প্রথমার্ধে হ্রাস পায় কিন্তু শেষার্ধে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপরন্তু, শহরের মাথাপিছু আয় বন্টনের বৈষম্য অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা প্রকৃতপক্ষে একটি কঠিন কাজ। এ কাজটি বিঘ্নিত হয়েছে নানাভাবে। যে কয়টি গবেষণা/জরিপ হয়েছে তাতে গণনা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। একটি সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এ সকল জরিপ পুনঃবিশ্লেষণ করলে যা প্রতীয়মান হয় তাহল গত ২৫

১৪। S. R. Osmani, Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh, in *Special Issue on Poverty in Bangladesh*, BIDS, Vol. XVIII, Number 3, September 1990, p. 86.

১৫। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 7 No. IA. মুশাররফ হোসেন লিখিত প্রবন্ধ “বাংলাদেশের দারিদ্র-সমস্যা ও সমাধান”, পৃ: ১৪৬।

বছরে দারিদ্র যৎসামান্য কমেছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালের ৩৮ শতাংশে নেমেছে।^{১৬} এ গণনার ভিত্তি হচ্ছে মাথাপিছু ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাস। সত্তরের দশকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে বা অন্য যে-কোন কারণে হোক দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আশির দশকে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে বন্যাজনিত কারণে দারিদ্র অবস্থার অবনতি ঘটে যা ১৯৮৮-৮৯ মাথাগুণতি সূচকে ধরা পড়ে। কিন্তু এ সংকট থেকে জনগণ নিজেদের কর্ম প্রচেষ্টায় বেরিয়ে আসে। এজন্য ৩৮ শতাংশ দারিদ্র নির্ণীত হয়।^{১৭}

অনপেক্ষ দারিদ্র ছাড়াও বর্তমানে আর একটি দলের উৎপত্তি হয়েছে যাদেরকে চরম দরিদ্র বলা যায়। এদের আয় দারিদ্র-সীমার আয়েরও ৪৪ শতাংশ নিম্নে। অতি সম্প্রতি এদের অনুপাত মোট দরিদ্র খানার ৪০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।^{১৮} এখানে উল্লেখ্য দারিদ্রকে সাধারণত ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ; যথা—চরম (Extreme), অনপেক্ষ (Absolute) এবং আপেক্ষিক (Relative) দারিদ্র। এরপরও আরও দুটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয় যাকে মাঝারি (Moderate) ও আলট্রা দারিদ্র বলে।

দারিদ্রের মস্তুর উন্নতি আসলে মাঝারি দরিদ্রদের বিশেষ উপকারে এসেছে। অন্যপক্ষে চরম দরিদ্রের অবস্থা আরও সংকটজনক করে তুলেছে। ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে অনপেক্ষ দারিদ্রের অন্তর্ভুক্ত চরম ও মাঝারি দারিদ্র একযোগে ৫ শতাংশ কমেছে কিন্তু এসময়ে চরম দারিদ্র ২ শতাংশ বেড়েছে।^{১৯} সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্রের উপকারে আসার কারণে এরূপ ঘটতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা চরম দরিদ্রের খুব সামান্য উন্নতি হয়েছে। অবশ্য এ অভিমত কতোটা যুক্তিযুক্ত তা বলা মুশকিল। কেননা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মসূচি সমাজের বিভূহীন নারী-পুরুষদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে যারা বাস্তবিকই চরম দরিদ্র। সুতরাং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরই বেশী উপকৃত হবার কথা।

অবশ্য, ১৯৮৮-৯৯ সালে পল্লীর প্রকৃত মজুরি হার কমেছে যা চরম দারিদ্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সময়ে মজুরি ১০ শতাংশ বাড়লেও খাদ্যশস্যের মূল্য বেড়েছে ১৭ শতাংশ।^{২০} এ অবস্থা মজুরদের ক্রয় ক্ষমতার নিম্নগতি নির্দেশ করে। আসলে বাংলাদেশে দারিদ্রের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি খুব একটা বড় কথা বা বড় ঘটনা নয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, অসংখ্য বিভূহীন, কর্মহীন নিরক্ষর মানুষ, শহরে-বন্দরে অসংখ্য বস্তিবাসী ও ভাসমান জনতা যে দরিদ্র তা বলাইবাহুল্য।

১৬। হোসেন জিল্লুর রহমান (১৯৯২) সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পৃ: III.

১৭। ঐ

১৮। ঐ

১৯। ঐ

২০। ঐ

এদের অধিকাংশ জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম। এরাই দরিদ্র। এ সকল দরিদ্র মানুষ দেশের সর্বত্র গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, আনাচে-কানাচে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গবেষণা/জরিপে এদের সংখ্যা একটু বেশী বা একটু কম নির্ধারিত হতে পারে। এতে দারিদ্রের অবনতি বা উন্নতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। কিন্তু দারিদ্রের উন্নতি-অবনতি যাই ঘটুক সাধারণভাবে যা বোঝা যায় তা হল, এ দেশে দারিদ্র এখনও ব্যাপকভাবে আছে এবং এটি এখনও একটি বিরাট সমস্যা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা করলে বোঝা যায় যে, এ দেশে দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কতোটা ব্যাপক ও গভীর। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক (১৯৯২) হিসেবে নিম্নে কয়েকটি দেশের দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের একটি বিবরণ প্রদত্ত হল :

সারণি - ৮

দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত

বাংলাদেশ	৪৩%	পাকিস্তান	২৩%	শ্রীলংকা	২৭%
ভারত	৩৫%	ইন্দোনেশিয়া	১৭%		

বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার, চিকিৎসার সুবিধে, সঞ্চয় হার প্রভৃতি আঞ্চলিক দেশসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি - ৯

অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক

মাথাপিছু আয় (মা: ডলার)	প্রবৃদ্ধির % হার	মাথাপিছু জিডিপি	সঞ্চয় হার জিডিপির শতাংশ	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতাংশ	শিক্ষার হার শতাংশ	ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা	
বাংলাদেশ	২২০	৪.০০	১,২০৬	৩	২.৭	৩৫.৩	৬,১৬৬
পাকিস্তান	৪০০	৬.৪	২,১২৪	১২	২.৯	৩৫.০	১,৯৮৭
ভারত	৩১০	৪.২	১,১৯৮	১৯	২.১	৫১.১	২,০৭৫
শ্রীলংকা	৫৫০	৪.৫	২,৭৭২	১৩	১.৩	৮৮.৫	৫,৫১৬
থাইল্যান্ড	১৬৬০	৭.৪	৫,৬৬৫	৩২	১.৪	৯৩.০	৪,৩৬১
বার্মা	২৫০	১.২	৬৭৬	১৩	২.১	৮১.০	৩,৩৫০
ইন্দোনেশিয়া	৬৪৫	৫.৯	২,১৯৮	৩৬	১.৮	৮৫.০	৭,২৩৮
নেপাল	১৮০	৩.১	১,১৬৫	৫	২.৩	২৬.০	২০,২৩৪

সূত্র : এশিয়া উইক, মে ৫, ১৯৯৩।

সারণি—৯-এ বর্ণিত আঞ্চলিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রটি পরিষ্কার হয়। সাম্প্রতিক এক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় আয় বন্টনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি সারণি আকারে নিম্নে দেখানো হল :

সারণি - ১০
বাংলাদেশে জনসংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় আয় বন্টন

আয় অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস	জনসংখ্যা (শতাংশ)	জাতীয় আয় বন্টন (শতাংশ)
ধনী	৫	২১
উচ্চ মধ্যবিত্ত	১৫	২৪
নিম্ন মধ্যবিত্ত	৪০	৩৬
গরিব ও বিত্তহীন	৪০	১৯

উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ৪০ শতাংশ গরিব ও বিত্তহীন জাতীয় আয়ের মাত্র ১৯ শতাংশ ভোগ করে, কিন্তু দেশের ৫ শতাংশ ধনী জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশ ভোগ করে থাকে। অন্য হিসেবে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ (গরিব ও নিম্নবিত্ত) দেশের জাতীয় আয়ের ৫৫ শতাংশ ভোগী। এ চিত্রে যেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হল গরিবদের বঞ্চনা, অর্থাৎ গরিবদের হাতে বা দখলে সম্পদ অতি অল্প। সুতরাং দারিদ্র্য জেকে বসে আছে। সম্পদ এভাবে কেন্দ্রীভূত হবার অনেক কারণ আছে। সে কারণগুলো নির্ধারণ করতে হবে। কারণ নির্ধারিত হলে সম্পদের সুষম বন্টনের পথ বাতলানো সহজ হতে পারে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি স্বত্ব

বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে পল্লীর দারিদ্র্য সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। সারণি—১১-তে এটা স্পষ্ট হয় :

সারণি - ১১
পল্লী বাংলার ভূমি মালিকানার প্রকৃতি

(১৯৭৮)

(১৯৮৩-৮৪)

ভূমি মালিকানাভিত্তিক দল (একরে)	খানার সংখ্যা (হাজার)	শতাংশ	খানার সংখ্যা (হাজার)	শতাংশ	বার্ষিক পরিবর্তনের হার (শতাংশে)
কার্যত ভূমিহীন	৬২২৫	৪৮.৫	৬৩৯৯	৪৬.৩	০.৪
ভূমিহীন	১৯৭৯	১৫.৪	১১৯৮	৮.৭	৮.৭
০.৫ একরের কম	৪২৮৬	৩৩.৩	৫২৯৪	৩৭.৬	৩.৬
ভূমি খানা	৬৬৩১	৫১.৫	৭৪১৯	৫৩.৬	২.১
০.৫০-০-৯৯	১৫১৬	১১.৮	১৬৬০	১২.০	১.৭
১.০০-২.৪৯	২৬৬০	২০.৬	২৯৭৯	২১.৬	২.১
২.৫০-৪.৯৯	১৪৩৬	১১.১	১৫৮৯	১১.৬	২.০
৫.০০-৭.৪৯	৫০১	৩.৯	৬৫০	৪.৭	৪.৯
৭.৫০-১৪.৯৯	৩৭৪	২.৯	৪১৫	৩.০	১.৯
১৫.০০+	১১৪	০.৯	১১৭	০.৯	০.৫
মোট	২৮৮৬	১০০.০	১৩৮১৮	১০০.০	১.৩

সূত্র : বিবিএস, ১৯৮৩-৮৪ কৃষি শুমারী ও পরিসংখ্যান বর্ষগ্ৰন্থ।

উপরের তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিখানা কার্যত ভূমিহীন। এ সকল খানার সদস্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। কৃষি খাতে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও উন্নত ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ হলে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু এ উৎপাদন ভূমিহীন কৃষকের সরাসরি উপকারে আসে না। বাংলাদেশের অসম ভূমি বন্টনের কারণে ভূমি দরিদ্র বাড়ছে বই কমছে না। দরিদ্র খানার অধিকাংশ ভূমি দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কার্যত ভূমিহীন পরিবার দরিদ্রদের ৬৫ শতাংশ এবং প্রান্তিক চাষী ২১ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর '৯২)। অবশ্য শ্রমিক খানার ৮৫ শতাংশ দরিদ্র। এদের মধ্যে পল্লীর কৃষি শ্রমিক খানার সংখ্যা অকৃষিখানার সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। কৃষির বিভিন্নমুখী সমস্যাও রয়েছে। সম্প্রতি যে সমস্যা হয়েছে তাহল কৃষক তাদের পণ্যের যে মূল্য পাচ্ছে তাতে তাদের উৎপাদন খরচ সংকুলান হয় না। দেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু ডাল, পেয়াজ, রসুন, তৈলবীজ প্রভৃতি কোনক্রমেই দেশের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এদিকে ধান ও পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনকারী কৃষককূল দারুণ হতাশা ও বিপদগ্রস্ত। এর ফলে দেশে ধান ও পাট চাষে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

কৃষি উৎপাদন

১৯৬৭-৭০ সালের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক উৎপাদনের তুলনায় ১৯৮১-৮৪ সালের বার্ষিক উৎপাদন বেড়েছে মাত্র শতকরা ১.৩৪ ভাগ। শুধু চাল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.৭৭ ভাগ। ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.১০ ভাগ, চাল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৯ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিম্ন।^{২১} চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭২/৭৩—১৯৭৯/৮০ সালে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৫% থেকে কমে ১৯৮০/৮১—১৯৮৪/৮৫ সালে ২.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। যদিও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু এ বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ লোক বাড়ছে। এদের মধ্যে প্রায় ৮ লাখ লোক কর্মপ্রত্যাশী হয়ে প্রতি বছর শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে। শহরে এদের বছরে ২/৩ লাখের বেশী কর্মসংস্থান হয় না। বাকী ৫/৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য পল্লী অঞ্চলে রয়েছে কৃষিকাজ। অথচ বছরে ৭০ হাজার লোকের বেশী এক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না।^{২২}

কৃষি খাতে ১৯৭৪ অর্থ বছর হতে ১৯৮৪-৮৫ সালে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল শূন্য। এ সময়ের অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে বার্ষিক ২.৯ শতাংশ হারে (মাহবুব হোসেন, মে ১৯৮৮)। তথা হক মনে করেন যে, আসলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার বিস্তৃতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই কঠিন। কেননা, এখানে শ্রমের অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার থাকার কারণে সরাসরি এ পরিমাপে অসুবিধা হয়।

সারণি - ১২

বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন হার : কেজি/হেক্টর, ১৯৮৪

	ধান	গম	পেয়াজ	আলু	বাধাকপি	টমেটো	আখ	পাট
বিশ্ব	৩২২১	২২১৭	৩৬৮৬	১৪,৮৩১	২৩,০৯৬	২৫,৫০৭	৬১,১৫০	২০৯৪
এশিয়া	৩২৮৯	২১৩৫	২৫৯৫	১২,৫৫৯	২০,২৯৬	১৯,০১৭	৫৫,০৫১	২১৩৫
বাংলাদেশ	২১০০	২১৬৬	৪৯২	১০,৪৪৬	৮,২৮৯	৭,৭৩২	৪২,২০৯	১১৫২

সূত্র : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৫।

উপরের তথ্যে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হার বিশ্বের ও এশিয়ার ঐ হারের চেয়ে কত কম। অথচ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ, দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষক। কৃষিই বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কিন্তু কৃষির এ দৈন্য-দশা দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

২১। বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি-তে লিখিত মুশাররফ হোসেন-এর 'বাংলাদেশের দারিদ্র : সমস্যা ও সমাধান', প্রাগুক্ত পৃ : ১৪২।

২২। ঐ

বাংলাদেশের লোক সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য সমস্যা ভবিষ্যতে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। এজন্য প্রয়োজন ফলন বৃদ্ধি ও কৃষি সম্প্রসারণ। দেশের মোট আবাদী জমির ২০ শতাংশ সেচ সুবিধে পাচ্ছে। তাছাড়া উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের অপ্রতুল সরবরাহও এ অবস্থার জন্য দায়ী। উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভবপর নয়। সেই সত্ত্বে সেচের সুবিধে আরো অনেক বাড়তে হবে। কেননা, সেচের দ্বারা যেমন ফলন অনেক বাড়বে, তেমনি একই জমিতে দু’তিনটে ফসলও করা সম্ভবপর হয়। অতএব, সেচ সুবিধের সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা

নিরক্ষরতা বা অল্পশিক্ষা দারিদ্রের সঙ্গী। এ দু’টি অবস্থা সাধারণত একই সত্ত্বে বিরাজ করে। শিক্ষার অভাব বা স্বল্পতা-হেতু দারিদ্র সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়; আবার দারিদ্রের কারণে শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র অধিক। এজন্য নিরক্ষরের হারও অধিক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাই এদেশে এখনও ৬৭.৬ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। পুরুষের নিরক্ষরতার হার ৬১.১ শতাংশ এবং মহিলা নিরক্ষরতার হার ৭৪.৫ শতাংশ।*

শিক্ষার প্রয়োজন নানা কারণে। তবে শিক্ষা দারিদ্র বিমোচনে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তদ্বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। একজন সাক্ষর মানুষ নিজের সবল ও দুর্বল দিক এবং উন্নতির রহস্য যতটা সহজে বুঝতে পারে একজন নিরক্ষর লোক তত সহজে সেটা পারে না। শিক্ষা শক্তি যোগায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। একজন গরিব শিক্ষার মাধ্যমে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে, বুঝতে পারে কারা, কিভাবে তাকে শাসন ও শোষণ করছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা গরিবের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এ শিক্ষা যে সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বা পুথিগত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। গরিবের জন্য এমন শিক্ষা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে যা তাদের আয় ও উন্নতির পথ সুগম করতে পারে। বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেয়। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা তাদের কর্মসংস্থানের সহায়তা করে। এক্ষেত্রে হাঁস-মুরগী ও মাছের চাষ, গরু-বাছুর লালন-পালন, শাক-শব্জীর চাষ, কুটির ও হস্তশিল্পের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ও

* গত ১-৩-১৯৯৪ তারিখে সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে (দৈনিক সংবাদ ২রা মার্চ, ১৯৯৪)।

প্রায়োগিক জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা করা যায়। শুধু প্রাথমিক নয়, এ সকল বিষয় উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা, আজকাল উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা অগণিত ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ হয়। উপরোক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তারা স্বপ্রচেষ্টায় ও স্ব স্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। অতএব, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা দরকার। তাত্ত্বিক বিষয়ে অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে শিক্ষাকে অপ্রায়োগিক করা হয়েছে। যে জন্য আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, দেশে অধিকাংশ গরিব মানুষ সাক্ষর নয়। এরা সমগ্র গরিবদের ৫৫ শতাংশ এবং চরম গরিবের ৬০ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর—৯০)। এদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় না। বড়দের সঙ্গে অতি ছোটবেলা থেকে এরা কাজে লেগে যায়। এমন একটা সময় বেছে নিয়ে এদেরকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা দরকার যখন এদের অবসর থাকে। কেবল, তাহলেই এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া সম্ভবপর হবে। খাদ্য, বই ও জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করলে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু ইম্পিত ফললাভ হবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় ও মহল্লায় মহল্লায় শিশুদের ছোট ছোট নৈশ বিদ্যালয় খোলা যায়। এ সকল বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে অসমর্থ কেবল তারা এখানে পড়বে। এ বিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই-পুস্তক-খাতা প্রভৃতি সরবরাহ করতে হবে।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে একটা আন্দোলনে রূপ দেয়া প্রয়োজন। অশিক্ষিত পিতা-মাতা যেন বুঝতে পারে যে, তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো একটা নৈতিক দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় বিষয়। যে শিক্ষা লাভ করে ছেলে-মেয়েরা তাদের কাজে আসবে, পরিবার উপকৃত হবে সে শিক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অভিভাবকেরা আগ্রহী হবে। যে শিক্ষা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূত হবে, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে সে শিক্ষার জন্য আগ্রহী হবে। যে দিন শিক্ষা পরিবার ও সমাজের দাবি ও চাহিদা মেটাতে পারবে কেবল সেদিনই শিক্ষার জন্য সকলে আন্তরিক হবে। শিক্ষাকে একগাদা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একগাদা কাজের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশে দারিদ্রের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হলে তা মাথাপিছু আয় ও খাদ্য বন্টনে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, পরিবেশ, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভূমি টুকরো টুকরো হওয়া, ভূমিহীনের ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, শহরে

ছিন্নমূল মানুষের ভীড় বাড়া। প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা সমাজে অরাজকতা ও অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ষাটের দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.৫ শতাংশ এবং ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৯ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধি সে সময় কম ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্য তা নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই ষাটের দশকে মাথাপিছু আয় বাড়ে মাত্র ০.৬ শতাংশ এবং সত্তরের দশকে ১.৫ শতাংশ। বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার এজন্যই অত্যন্ত কম। আর সে কারণে মূলধন গঠনে হয় প্রবল সমস্যা। খাদ্যশস্য উৎপাদন ষাটের দশকে ১০ মিলিয়ন টন থেকে আশির দশকে ১৬ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়। সুতরাং খাদ্যশস্য ঘাটতি পূর্বের মতোই অর্থাৎ ১.৫ মিলিয়ন থেকে ২.০ মিলিয়নে থাকে। অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদন বাড়তি জনসংখ্যা সাবাড় করে দেয়।

জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশের (৬৭ শতাংশ) বয়স ১৫ বছরের নিম্নে হওয়ায় তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। অন্যদিকে এরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১০ মিলিয়ন। তৎপর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা সোয়া বারো কোটির বেশী। ১৯৭৪-৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৮ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ২.৭ শতাংশে। কারো কারো মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ২.২ শতাংশ। এখনই যদি ২ শিশু পরিবার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় তাহলেও ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২৩ কোটি। ২৩ এমনকি এ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে উন্নীত হবে। এতো অধিক সংখ্যক মানুষ ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল আয়তনের একটি দেশে খাইয়ে-পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখা মোটেও সহজ হবে না। তাই দেশের সামনে এখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক, জনসংখ্যা রোধ কর্মসূচি জোরদার ও ফলপ্রসূ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমিত রাখা ; দুই, ইতোমধ্যে সৃষ্ট জনসংখ্যাকে বিভিন্ন কৌশলে ও কর্মসূচি অবলম্বনপূর্বক অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে নিয়োজিত করা।

খাদ্য ও পুষ্টি

দারিদ্র নির্ণয়ে পুষ্টি ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাপ আধুনিককালে সর্বজনগ্রাহ্য একটি পদ্ধতি। ক্যালরি গ্রহণের নির্দিষ্ট সীমা অনুপাতে পল্লীর ও শহরের মানুষের দারিদ্র পরিমাপের কয়েকটি সারণি ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্যালরি গ্রহণের

পরিমাণ পরিমাপ করা নানাকারণে একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণের সম্পর্ক, দেশের মানুষের আয়-ব্যয়, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যের সহজলভ্যতা, মূল্য, উৎপাদন প্রভৃতি নানা বিষয় ও ঘটনা।

বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ সালের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৯৮৫-৮৬ সালে বৃদ্ধি পায়। এ পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেখা যেতে পারে :

সারণি-১২

গ্রাম

	শহর	পল্লী
১৯৭৩-৭৪	৭১৩	৬৭৫
১৯৮১-৮২	৭৪৯	৬৮৫
১৯৮৩-৮৪	৭৫৫	৭৩৫
১৯৮৫-৮৬	৮১৪	৮০৪

সূত্র : মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮।

বাংলাদেশে ১৯৮৪-৮৫ সালে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ গড়ে প্রতিদিন ১৪ আউন্স খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। গরিবদের মধ্যে ১৭% গড়ে দৈনিক ৮ আউন্স, ৫৩% দৈনিক ১২.৫ আউন্স এবং ৩০ শতাংশ দৈনিক ২০ আউন্স খাদ্য গ্রহণ করে।^{২৪}

শিশু-পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যে দৃষ্ট হয় যে, শিশুদের চরম অপুষ্টি ১৯৭৫-৭৬ সালে ২৫.৮ শতাংশ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৯.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মাঝারি ধরনের অপুষ্টি ৫৩.০ শতাংশ থেকে ৫২.২ শতাংশে দাঁড়ায় (মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮)। অবশ্য, ১৯৯০ সালে সামগ্রিক পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। এ সময় ৫ বছরের নিচের শিশুদের ৫০ শতাংশ অপুষ্টির শিকার হয়। বাংলাদেশে ৩৫.২% শিশুর শারীরিক বর্ধন চরমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ৩০.৩% শিশু মোটামুটিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ১/৩ ভাগ শিশু ওজনে কম থাকে এবং ১৪% শিশু নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়।^{২৫}

বাংলাদেশে মহিলাদের পুষ্টির অবস্থা আশংকাজনকভাবে খারাপ। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ মহিলারা দৈনিক মাথাপিছু ১৩০০ কি: ক্যা:—এর বেশী গ্রহণ করতে পারে না। দেশের ৮৫ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে। এমনকি মেয়েদেরকে ছেলেদের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণে বাধ্য অথবা অভ্যস্ত করা হয়। মা-বাবার নিকট পুত্র সন্তান সম্পদ, কন্যা সন্তান বিপদ ও দুর্ভাগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠাবার ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান। এ জন্য বাংলাদেশে মহিলা শিক্ষিতের হার ২৯ শতাংশ অথচ পুরুষ শিক্ষিতের হার ৪৫ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর—৯২)। মাত্র ৮ শতাংশ পুরুষ প্রধান খানা

২৪। মুশাররফ হোসেন, বাংলাদেশের দারিদ্র : সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত পৃ : ১৪৬।

২৫। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : বিবিএস-এর Report of the Child Nutrition Status Survey, 1989-90 যা ১৯৯১-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয়।

চরম দরিদ্র অথচ ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রধান খানা চরম দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৮-৮৯ সালে মহিলা প্রধান খানা পুরুষ প্রধান খানার চেয়ে গড়ে ৪০ শতাংশ কম আয় করেছে। পল্লীর ৯ শতাংশ খানা মহিলা প্রধান ও মহিলা দ্বারা চালিত। এরাই সবচেয়ে নড়বড়ে এবং অসুবিধেভোগী একটি সামাজিক শ্রেণী।

বেকারত্ব

বাংলাদেশে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। কেউ কেউ বলেন ২ কোটি শিক্ষিত/অশিক্ষিত মানুষ বর্তমানে বেকার ও অর্ধ বেকার। ১৯৬১ সালের আদম শুমারিতে ৫০.৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ০.০৮ মিলিয়ন বেকার এবং ১৯৭৪ সালের আদম শুমারিতে ৭৬.৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার ০.৫০ মিলিয়ন বেকার দেখানো হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ০.৩০ কোটি শ্রমবর্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে যা প্রকৃত শ্রমশক্তির বৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। ১৯৭৯-৮০-তে ২৭.৪৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ২৫.৩ মিলিয়নের কর্মসংস্থান হয়, বেকার থাকে ২.১৭ মিলিয়ন যা মাথাপিছু গণনার ভিত্তিতে শ্রমশক্তির ৮ শতাংশ।^{২৬}

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে বলা হয়েছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ লোক চরম দরিদ্রের মধ্যে বাস করে, ৭৪ শতাংশ মানুষ লিখতে ও পড়তে জানে না, ৩৩% মানুষের কোন কর্মসংস্থান নেই। এ সময় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, “এ সমস্যা একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের আকার নিচ্ছে”। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দু’হাজার সাল নাগাদ একান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সংখ্যা ১১৩ মিলিয়ন-এ দাঁড়াবে।

পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমতি হয়েছিল। এ বর্ধিত কর্মসংস্থানের ৬৮ শতাংশ হবে কৃষি-ক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্রে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে কর্মসংস্থানের এ লক্ষ্য অর্জিত হবে এবং ফলে দারিদ্র বিমোচন ঘটবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্কের বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সঙ্গে ভূমিবান ও ভূমিহীনদের সম্পর্ক একরূপ নয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি গেলে অবশ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ সময় এ বৃদ্ধির হার এমন নয় যে তা শ্রমবাজারে অধিক চাহিদা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

১৯৮৯ সালে বেসামরিক শ্রমশক্তি ৫০.৭ মিলিয়ন স্থিরীকৃত হয়, অথচ ১৯৮৫-৮৬ সালে উক্ত শ্রমশক্তির পরিমাণ ছিল ৩০.৯ মিলিয়ন এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ২৭.৪৭ মিলিয়ন। এত বড় আকারের পরিবর্তনের কারণ হল ১৯৮৫-৮৬ সালে মহিলা শ্রমশক্তি বৃদ্ধি ঘটে কৃষিখাতে। ১৯৮৯ সালে শ্রমশক্তি জরিপের প্রশ্নমালায় মহিলাদের কিছু নির্দিষ্ট শ্রম এলাকা অন্তর্ভুক্ত করায় এ পরিবর্তন সূচিত হয়। পূর্বে মহিলাদের কৃষি ক্ষেত্রে এ সকল কাজ অর্থনৈতিক কর্ম বলে পরিগণিত করা হয়নি। এ সকল কাজ কর্মসংস্থান

হিসেবে বিবেচিত না হলে মহিলা কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৬ মিলিয়ন এবং মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ হয় ৩৬ মিলিয়ন। সুতরাং কর্মসংস্থানে প্রকৃত সংখ্যা নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর কাজ অর্থনৈতিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে তার ওপর।

সারণি - ১৩

শ্রম ও শ্রমশক্তি খাতের সূচক

বৈশিষ্ট্য সূচক	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৫-৮৬	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৯	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯০ (পি)
১। মোট বেসামরিক জনশক্তি (মিলিয়ন) :			
পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
মহিলা	৩.২	২১.০	২০.১
মোট (পুরুষ+মহিলা)	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২। বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন) :			
পুরুষ	০.৩	০.৪	০.৬
মহিলা	০.১	০.২	০.৪
মোট	০.৪	০.৬	১.০
৩। বেকারত্বের হার (অর্ধ-বেকারত্ব বাদে) :			
পুরুষ	০.৮	১.৩	১.৯
মহিলা	৩.২	১.১	১.৯
উভয় (পুরুষ+মহিলা)	১.১	১.২	১.১

সূত্র : বিবিএস, পকেট বই, ১৯৯৩, পৃ : ৯৯।

আসলে দেশে অর্ধ-বেকারত্বের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী যা ৩৫% থেকে ৪০% বলে হিসেব করা হয়। ১৯৯০ সালে মোট শ্রমশক্তি ৩৭.১৩ মিলিয়ন ধার্য হয় যার ২৩.২৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান করার কথাও বলা হয়। কিন্তু কর্মসংস্থানের এ লক্ষ্যমাত্রার ধারের কাছেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। কর্মসংস্থান সম্পর্কে নিম্নের সারণিটি লক্ষণীয় :

সারণি - ১৪

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা

কর্মসংস্থান	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৪-৮৫	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৫-৮৬	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৯
কৃষিতে (হাজারে)	১৬,৭১২	১৭,৪৮৪	৩২,৫৭৩
শিল্প	২,৬৮৮	৩,০১৯	৬,৯৭৭
আত্ম কর্মসংস্থান	৩৯.৪	৩৮.০	২৯.৬
দিন-মজুর	৩৯.৫	১৯.০	৯.৫

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯২, পৃ : ৮৪।

উপরের তথ্যে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প, আত্মকর্মসংস্থানে ও দিন-মজুরিতে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তা দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমের বাজারের চাহিদা

মেটাতে সমর্থ হয় না। এ জন্য দেশের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত থাকে। উৎপাদনের এ সকল ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে না পারলে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীভূত হবে না এবং বেকারত্ব দূরীভূত না হলে দারিদ্র বিমোচনও সম্ভবপর নয়।

পাকিস্তান আমলে দারিদ্র বিমোচন

পাকিস্তান আমলে এ দেশে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র বিমোচনের উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি ছিল না। ১৯৫৩ সালে ভি-এ আই ডি অর্থাৎ ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ভি-এ আই ডি কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। ১৯৬০-৭১ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পল্লীর দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। সে সময় কৃষির উন্নতির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করতে দেশের কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল সরকারের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এতদুদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এ জন্য উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি সরবরাহ ও জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার বিভিন্নভাবে সচেষ্ট হয়। এ সকল কর্মসূচি সরাসরি দারিদ্র পরাস্ত করার জন্য নয়, বরং পরোক্ষভাবে দারিদ্র নিরসনের সহায়ক ছিল। এরপর কৃষি ঋণ দেয়ারও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী আখতার হামিদ খান কুমিল্লা দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর সৃষ্ট টিটিডিসির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জলসেচ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ প্রকল্প ও গণ-স্বেচ্ছাশ্রম প্রকল্পের প্রবর্তন হয়। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে খাল খনন ও পুনঃখনন, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, ছোট-ছোট পুল, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করা হয়। বিএডিসির মাধ্যমে জলসেচের জন্য লো-লিফট পাম্প সরবরাহ করা ও গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো হয়। বিএডিসি উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করে। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতিতে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির স্থলে কিছু সংস্কার করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ড সৃষ্টির পশ্চাতে ৫টি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল; যথা—(ক) অধিক হারে কৃষি উৎপাদনে গতি সঞ্চার, (খ) পল্লীর গরিবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, (গ) সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হারে সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি, (ঘ) উন্নয়ন সেবা-প্রদান বৃদ্ধির জন্য পল্লীতে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি। আয়ুব খানের বুনয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের কিছু কিছু কাজ করা হয়। তখনকার সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি নামে কোন কর্মসূচি তখন সরকারের পরিকল্পনায় ছিল না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন

স্বাধীনতার পর যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় তার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্বের সমাধানপূর্বক দারিদ্র সংকোচন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে সঠিক মুদ্রানীতি ও মূল্যনীতি অবলম্বন ও বাস্তবায়নপূর্বক সম্পদের সুখম বন্টন। এ ছাড়াও এ পরিকল্পনার আরো ১১টি বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দেশীয় সম্পদ আহরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, সম্পদের ও আয়ের সুখম বন্টন এবং বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ন্যূনপক্ষে ৫.৫ শতাংশ অর্জন প্রভৃতি (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃ : ৯-১০)। দারিদ্র বিমোচনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এ পরিকল্পনাকালে নানাবিধ কারণে দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর আরো একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) গৃহীত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) শুরু হয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বাংলাদেশীদের মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলার, দারিদ্র ছিল সর্বব্যাপী। এ জন্য এ পরিকল্পনায় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাস্তবোচিত পন্থায় দেশে দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দেশজ সম্পদ ও গ্রামীণ সম্পদ পানি, মাটি ও মানুষের সদ্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কথা উল্লেখ করা হয় (২য় পঃ বা: প: পৃ: ৩১)।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনকল্পে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। যদিও এ কর্মসূচি পল্লীপূর্ত কর্মসূচির চেয়ে বৃহদাকার ছিল কিন্তু তা দারিদ্র নিরসনের জন্য কোনোমতেই স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এ কর্মসূচির অধীন প্রকল্পে গ্রামীণ দারিদ্র মানুষের সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং কাজের বিনিময়ে যে গম শ্রমিকরা পায় তাতে অনাহার দূরীভূত হয়। এ সময়ে চুইয়ে পড়া অর্থনীতির অসরতাও প্রমাণিত হতে থাকে। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার ও পরিকল্পনাবিদরাও মনোযোগী হয়। উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এ সময় গুরুত্ব পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন দর্শনের চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কাঠামোগত পরিবর্তন, উদার ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রভৃতি ধারণা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। এ সময়ে পূর্বের মতোই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পল্লী-পূর্ত কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও সমন্বিত

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু তা দেশের অগণিত ও বৃহত্তর গরিব জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয় না। ১৯৭৪-৮৫ সময়কালে এমন চিত্র ও প্রমাণ পাওয়া যায় না যাতে মনে করা যায় যে, প্রথম তিনটি পরিকল্পনার দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।^{২৭}

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অনুভূত হয় যে, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ। সুতরাং এ পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দরিদ্রের সুযোগ-সুবিধে বর্ধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দরিদ্রের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। দারিদ্র ও অসুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের জন্য কৌশল, নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ ও মহিলাদেরকে অন্যান্যদের সঙ্গে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা বিতরণ। দেশে নিচের মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, বর্ধিত হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এ সকল দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষভাবে কাজে আসেনি। দেশে কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি কোনটাই হয়নি। তাছাড়া, দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পন্থা, পরিকল্পনা, কোনটাই তখন পর্যন্ত সুচারুরূপে গৃহীত হয়নি, যেজন্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিও স্থায়ী রূপ পায়নি। অবশ্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি শিরোনামে পরিকল্পনা কমিশনে একটি সেল খোলা হয়েছে।

পরিকল্পনাবিদদের ধারণা প্রবৃদ্ধি ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য বিশেষ উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় পরিকল্পনায় সরাসরি এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।^{২৮} এ দিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৫%, অর্জিত হয়েছে ৪%, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪%, অর্জিত হয়েছে ৩.৮%, তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪%, অর্জিত হয়েছে ৩.৮%। সুতরাং প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কখনই অর্জিত হয়নি।

ডঃ ইউনুস মনে করেন যে, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা দেশী পণ্য কিনবে। এতে দেশী পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অর্থনীতি গতিশীল হবে। অন্যপক্ষে ধনীদের আয় বৃদ্ধি পেলে তারা বিদেশী ভোগ্যপণ্য ক্রয় করবে, দেশে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি হলে দেশ পরনির্ভরশীল হবে, অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে।^{২৯}

২৭। রেহমান সোবহান-এর সভাপতির ভাষণ 'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, খণ্ড : ৭নং ১-এ, ১৯৮৬, ঢাকা পৃ : ১০।

২৮। মুহম্মদ ইউনুস, "প্ল্যানিং ফর দি পুওর", বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, প্রাগুক্ত পৃ: ১৩৯।

২৯। এ

আসলে দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি উৎপাদনশীল কাজে লেগে যায় এবং হাজারো রকম পণ্য উৎপাদন শুরু করে, তাহলে দেশে পণ্যের অভাব ঘুচবে, দেশ আত্মনির্ভরশীল হবে, অর্থনীতি স্বয়ম্ভর হবে। দেশে যে বিরাট জনগোষ্ঠী রয়েছে তাকে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জাতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কর্মে লিপ্ত করার ওপর গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি এখন জোর-শোরে উচ্চারিত হচ্ছে। “জনতা জাগলে দেশ জাগবে” এটাই হবে আজকের শ্লোগান। সেজন্য পরিকল্পনায় শুধু ধনীদের জন্য কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, গরিবদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যারা দেশের আনাচে-কানাচে অনাদরে-অবহেলায় উপেক্ষিত ও শোষিত হচ্ছে তাদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দেশের সার্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ওদেরকে টেনে ওঠাতে না পারলে, ওরাই ধনীদের টেনে পশ্চাতে নিয়ে যাবে। অথবা ওরা ধনীদের স্থান জোর করে দখল করে বসবে। এ দু’য়ের কোনটাই কোনদিন সুখকর হবে না। তাই দেশের যে পরিকল্পনায় সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি ও দর্শন স্থিরীকৃত হয় সে পরিকল্পনায় বৃহত্তর সমাজের ও মানুষের সরাসরি উন্নতির জন্য অর্থ ও দিগদর্শন থাকা প্রয়োজন।

বৈদেশিক সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

বাংলাদেশ ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা থেকে ৬০,৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। বলা যায় বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতিটাই বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ সাহায্য দ্বারা বাংলাদেশে যে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুবিধাভোগী কারা? এ প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজভাবে বলা যায় যে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত, ধনী, ব্যবসায়ী, আমলা ও অন্যান্য অনেকে। এরা কেউ গরিব মানুষের পরিবার থেকে আসেনি। বৈদেশিক ঋণ দ্বারা যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে দরিদ্র মানুষের অতি সামান্য অংশ শ্রমিকের কাজ পেয়েছে। কিন্তু ঐ সকল শিল্পের বা পাবলিক এন্টারপ্রাইজের অধিকাংশই আজ লোকসান দিচ্ছে এবং শেষ নিঃশ্বাসের দিন গুণছে।

কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য এসেছে এবং তদ্বারা যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুফল হতে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া, বৈদেশিক সাহায্যের একটা বড় অংশ চলে গেছে গাড়ি-ঘোড়া ও প্রযুক্তি ক্রয়ে, দালান-কোঠা নির্মাণে, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের বেতন ও ভাতা প্রদানে। ঠিকাদার, ইন্ডেন্টর, আমদানীকারক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা এ সকল প্রকল্প থেকে লাভবান হয়েছে।^{৩০} অনেক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নানা কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে, ফলে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু,

প্রকল্প ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। অথচ দেশ এখন বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। মথাপিছু এ ঋণের বোঝা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। প্রতি বছর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ডেট সার্ভিসিং-এর জন্য গুণতে হচ্ছে। বাংলাদেশকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত ১২,৮০০ কোটি টাকা সুদ-আসলে পরিশোধ করতে হয়েছে।^{৩১}

দারিদ্র বিমোচন, দুর্বলকে সবলকরণ ও ক্ষমতা প্রদান

দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসেবে ইদানীং নানা মতবাদের ও তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। গম/রিলিফ দিয়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক পন্থা আবিষ্কার ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন। গরিবের হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন তাদের সাক্ষর ও কাজের জন্য প্রস্তুত করা, কাজ দেয়া, আয়ের সংস্থান ও স্বকর্মের ব্যবস্থা করে দেয়া, আয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় ও পুঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা, সম্পদ ও ক্ষমতার অংশীদার করা এবং তাদেরকে যাবতীয় শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখা। তাদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও দলভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ গরিবের জন্য ও তাদের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে তদ্বারা ঐ সকল কর্মসূচি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে গরিবের হাতকে মজবুত ও শক্তিশালী করার পরই তাদের দারিদ্র মোচন সম্ভব।

দরিদ্রের জন্য পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ করে তার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্রদের যথাযথ ভূমিকা, প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দরিদ্রের ন্যায্য পাওনা বিতরণের সঠিক পন্থা চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচিতে যে অর্থ ব্যয় হবে তা কেবল দরিদ্ররাই ভোগ করবে। সেটা তারা কাজের ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে করবে। এ অর্থে অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। উপরন্তু, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হবে, যে কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণীত ও বাস্তবায়িত হবে তাতেও তারা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে।

ভূমি সংস্কারের নামে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি মালিকানায় প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। দরিদ্র চাষীদের চাষাবাদে সহায়তার জন্য ভূমি বন্টন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রকৃত চাষীর ও ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারী খাস জমির বন্টন করা যেমন দরকার, তেমনি সে জমিতে তারা যেন চাষাবাদ করতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থাও করা দরকার। দেশে আজ অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের সংখ্যা অনেক। এদের জমি বর্গাদাররা চাষ করে, মালিকরা যা পায় তাই তাদের নিকট যথেষ্ট। তারা জমির চাষাবাদের খোঁজ-খবর কমই নিয়ে থাকে। প্রয়োজনে লাঙ্গল যার জমি

তার এ রকম ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থা যদি একান্তই কায়ম করা সম্ভবপর না হয় তাহলে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অনুপস্থিত ভূমি মালিকগণ তাদের জমি চাষাবাদের খোঁজ-খবর রাখতে, মূলধন ও কৃষি উপকরণ যোগান দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা জমির প্রতি অধিক যত্নবান ও আগ্রহী হবে। অন্যথায়, বর্গাদারদের এমন সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে চাষে লিপ্ত হয় এবং ফসলের ভাগ এমনভাবে পায় যাতে তাদের লোকসান না হয়ে লাভ হয়।

শুধু আইন করে এরূপ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভবপর হবে না। কৃষকদের সংগঠন ছাড়া তাদের দাবী-দাওয়া তারা কোনদিনই আদায় করতে পারবে না। দেশে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের সংগঠন আছে, কিন্তু ভূমিহীন গরিব কৃষকের কোন সংগঠন নেই। তাই তারা তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারে না। কৃষক সংগঠনই পারে কৃষকদের সকল প্রকার দাবি ও পাওনা আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কিন্তু এই যে এতসব 'করা' তা কিভাবে সম্ভব? যার মাথায় বোঝা, তাদেরই বোঝা বহন করতে হয়। অন্যেরা বহন করবে না। সুতরাং দরিদ্র মানুষের দারিদ্র তাদেরকেই হটাতে হবে। ধনী বা এলিটদের দ্বারা গরিবদের গরিবী হটানো বড় কঠিন কাজ। গরিবের সমস্যা, গরিবের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ তারাই ভালোভাবে বুঝে থাকে। ধনীরা/এলিটগোষ্ঠি বুঝতে পারে না, অনেক সময় কিছুটা বুঝেও বুঝতে চায় না। তাদেরও একটা স্বার্থ আছে। গরিবের জন্য ধনীরা কি সে স্বার্থ ত্যাগ করবে? এ একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ অবস্থায়, ধনী/এলিটদের দ্বারা প্রণীত আইন-কানুন, পরিকল্পনা, কর্মসূচি, প্রকল্প প্রভৃতি গরিবের গরিবী হটানোর কাজে, তাদের হাতকে শক্তিশালী ও মজবুত করার কাজে কতোটা লাগবে? কেননা, মানুষের 'স্বার্থ' এমনই একটি জিনিস যা তারা কদাচিৎ ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং ধনী/এলিটদের স্বার্থ যেখানে বিঘ্নিত হবে, সেখানে তারা মনোযোগী ও কার্যকর হবে না। এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য গরিবের স্বার্থ, গরিবের উপকার ও উন্নতি গরিবরাই দেখবে ও বুঝবে। সেজন্য ক্ষমতা ও সম্পদের বলয়ে তাদের প্রবেশাধিকার ও পদচারণা নিশ্চিত করা ছাড়া দারিদ্র বিমোচন হতে পারে না। বিপ্লবাত্মক মনে হলেও এ বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত সরল এবং সকলে স্বীকারও করেন। কিন্তু তা অন্তরে মেনে নেয়া এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উপরের আলোচনায় যে সকল বিষয় গরিবের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অনভূত হয় তা হচ্ছে :

- (ক) গরিবের সম্পদে প্রবেশাধিকার ;
- (খ) গরিবের ক্ষমতায় প্রবেশাধিকার ;
- (গ) গরিবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রবেশাধিকার ;
- (ঘ) গরিবের উৎপাদনশীল কর্মে প্রবেশাধিকার ;
- (ঙ) গরিবের সরকারী তথ্য প্রবাহে প্রবেশাধিকার ;
- (চ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুযোগে প্রবেশাধিকার ;
- (ছ) পরিকল্পনায় ও প্রকল্পে প্রবেশাধিকার।

এটা আইন প্রবর্তন করে কার্যকর করতে হবে। যদি বলা হয় দেশে গণতন্ত্র আছে, গরিবরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তার উত্তরে বলা যায় যে, গরিবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে রয়েছে যে স্থান থেকে তারা কোনদিনই সম্পদে, ক্ষমতায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে না। জাতীয় পরিষদে প্রবেশতো গরিবদের জন্য চাঁদে পৌঁছানোর মতোই একটা ব্যাপার। এমনকি ইউনিয়ন পরিষদেও গরিবরা নির্বাচিত হতে পারে না। সেখানেও বংশীয় মর্যাদার ও টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জাতীয় পরিষদ পর্যন্ত গরিবদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না এবং তাদের দারিদ্রও ঘুচবে না।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র বিমোচন বা দারিদ্র হটানো কোন সাময়িক ব্যবস্থার দ্বারা কোনদিনই সম্ভবপর হবে না। এ জন্য প্রয়োজন স্থায়ী, সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর ব্যবস্থা। বাংলাদেশে এনজিওগুলো যে কৌশলে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি কার্যকর করেছে তাকে টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ বলা হয়। অর্থাৎ তারা সমাজের বিভূহীন মহিলা ও পুরুষদের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সুবিধাভোগী সদস্যের মধ্যে ৯৪ শতাংশ বিভূহীন মহিলা। সরকারী কর্মসূচিতেও টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ এসেছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, নিজেরা করি, আশা এবং আরো অনেক এনজিও দেশের বিভূহীনদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে ১১৩টি বিদেশী এনজিও এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত ১৫০০টি স্থানীয় এনজিও ছিল। ১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওর সংখ্যা ৮১৪টি। এ ছাড়া বি আর ডি বি, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থাও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের কোটিখানেক গরিব মানুষকে দারিদ্রের কুচক্র থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। আরো চার থেকে সাড়ে চার কোটি দারিদ্র মানুষ থাকছে। এদের সকলকে কি এ কর্মসূচির মধ্যে নিয়ে আসা যাবে? অনেকে বলেন নিশ্চয়ই যাবে। যদি এদেরকে উৎপাদনে বসিয়ে দেয়া যায়, তা হলে এদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার পেতে অসুবিধে হবে না। সীমান্তের ওপার থেকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-শব্জী না এসে তখন এখান থেকে ঐ সকল পণ্য সীমান্তের ওপারে যাবে। একদিন এখান থেকেই যেতো; এখন সেখান থেকে আসে। পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে হবে। এদেশের পরিবর্তন হয়েছে নিম্নমুখী। এটাকে উর্ধ্বমুখী করতে পারলে বাজার এ দেশের অনুকূলে আসবে। যেমন-পোশাক শিল্পে এসেছে। হাত আছে, হাতে কাজ নেই, বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি খাটাবার জায়গা নেই। হাতে কাজ দিলে ও বুদ্ধি প্রয়োগের জায়গা দিলে সচ্ছলতা আসবে। বাংলাদেশের মানুষকে বিদেশী মরিচ, আদা, পেয়াজ, রসুন,

ডাল কিনে খেতে হয় চড়া দামে। এ সকল পণ্য এদেশের চাহিদা মেটাতে পারে না। উন্নত জাতের বীজ বপন ও যান্ত্রিক চাষের মাধ্যমে অবশ্যই এ অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। কৃষি খাতকে শুধু ধান-পাট চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে চাঙ্গা করা যাবে না। উন্নত জাতের আলু, ডাল, পেয়ারা, রসুন, মরিচ, তৈলবীজ এবং সেই সঙ্গে আম, কলা, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল, হাঁস-মুরগী-মৎস্য চাষের এবং গাভী পালনের মাধ্যমে সমগ্র কৃষিখাতকে অধিকতর উন্নত ও বিস্তৃত করার মধ্যে দেশের দারিদ্র বিমোচনের একটা বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এ খাতের উন্নয়ন হলে তা বিভিন্নভাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। যেমন—(১) এ সকল পণ্য উৎপাদনে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হবে। সুতরাং দেশে কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে; (২) এ সকল পণ্য দেশের চাহিদা মেটাতে পারবে এবং তা দরিদ্র মানুষের প্রোটিন, ক্যালরি ও ভিটামিনের চাহিদা পূরণে অবদান রাখবে; (৩) এ সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। সুতরাং কৃষিখাতের উন্নতি ও বিস্তৃতি ব্যতিরেকে দারিদ্র বিমোচন সুদূর পরাহত।

এবার শিল্পখাতের বিষয়টি আলোচনা করা যায়। শিল্পখাতের উন্নতি ব্যতিরেকে সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশ এ খাতটি আজ পর্যন্ত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্পখাতের অবদান অর্থনীতিতে এখনও অপেক্ষাকৃত অল্প। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৮%, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৮.৮%, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৮.৪% এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৮.৭৮ শতাংশ ছিল।^{৩২} সুতরাং গত দু'দশকে অর্থনীতিতে কাঠামোগত তেমন উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেনি। বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট খাত মিলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১২ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। সরকারী খাতের শিল্পগুলোর অধিকাংশ রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। যেগুলো চলন্ত রয়েছে তারও অধিকাংশ ক্রমাগত লোকসান দিয়ে যাচ্ছে।

রপ্তানী ক্ষেত্রে একমাত্র পোশাক শিল্প ও হিমায়িত সামুদ্রিক মৎস্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিছু কিছু অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানী বাড়ছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রচলিত পণ্যের রপ্তানী কমেছে। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১১০৩.৮ কোটি টাকা। এ ঘাটতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৯০-৯১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫১২৮.০ কোটি (বিবিএস বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯২) টাকায়।

বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সে সঙ্গে দারিদ্র বিমোচন সম্ভবপর হবে না। দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের জন্য প্রয়োজন ভোগ্যপণ্য আমদানি হ্রাস ও দেশজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। ভোগ্যপণ্য যতটা সম্ভব দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ও রপ্তানীভিত্তিক শিল্প স্থাপন। এ জন্য প্রয়োজন (ক) বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার খোঁজা ও সৃষ্টি করা; (খ) যে সকল পণ্যের বাজার

আবিষ্কৃত হবে সে সকল পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; (গ) পণ্যের যথাযথ গুণ ও মান বজায় রাখা। এ জন্য প্রয়োজন হবে দেশে (ক) শিল্প স্থাপন; (খ) শিল্পোদ্যোগের নানারকম উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান; (গ) বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি; (ঘ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ, শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট করা ও উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি।

এভাবে শিল্পখাতকে রপ্তানীমুখী খাতে পরিণত করতে না পারলে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। গরিবদের দ্বারা আত্মকর্ম সংস্থানের যে ব্যবস্থা তাতে পুঁজি কম লাগে; কিন্তু কর্মসংস্থানের খুবই অল্প সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যপক্ষে বৃহদাকার শিল্পে পুঁজি বেশী লাগে; অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রথমটির সুবিধে হল তা নিম্নবিত্তের মধ্যে ও সারাদেশে ব্যপ্ত করা যায়। দ্বিতীয়টির সুবিধে হল তা অল্প সময়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারে। সুতরাং সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের সম্ভাবনা কতটুকু তা বিশেষভাবে বিচার্য।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের শিল্পখাতের অগ্রগতি শুধু সমাজের বিত্তবান বা এলিটগোষ্ঠিরই উপকারে আসেনি। এ অগ্রগতিতে সারা দেশের মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। দরিদ্র মানুষের দারিদ্র বিমোচিত হয়েছে। সুতরাং দারিদ্র বিমোচনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

- ১। রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৯৮০।
- ২। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫-১৯৪৭), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৭৫।
- ৩। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আধুনিক যুগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, বাংলা ১৩৮১।
- ৪। রহিম, আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬), অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮২।
- ৫। রহিম, আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৫৭৬-১৭৫৭), অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাবিব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮২।
- ৬। বন্দোপাধ্যায়, সুখময়, বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ১৯৮০।
- ৭। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ; বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৭।
- ৮। ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা : এশিয়াটিক প্রেস, ১৯৯৩।
9. Banaji, D. R.; Slavery in British India, Kitabmahal, Bombay : 1933.
10. Alamgir, M. K. Development Strategy for Bangladesh, Dhaka, Centre for Social Studies (June, 1980).
11. Anand, Sudhir., Inequality and Poverty in Malayasia, London : Oxford University Press (1983)
12. Arens and Beurden., Jhagrapur (Bengali Edition), Nayarhat, Ganoproskashani (1980).
13. Banon, Ian., The World Bank Support for the Alleviation of Poverty, Washington D. C. : The World Bank (1988).
14. CIRDAP STUDY SERIES (No. 77) : Socio-Economic Disabilities and Disadvantages of the Rural Bangladesh, August, 1985, CIRDAP, Chameli House, Dhaka.
15. Chambers, Robert., Rural Development—Putting the Last First, Harlow, Essex : Longman Group (1983).
16. Demery, Lionel and Tony Addison., The Alleviation of Poverty Under Structural Adjustment, Washington D. C. : The World Bank (1987)

17. Hagenaaars, A. J. M., The Perception of Poverty, Amstardam : Elsavier Science Publisher.
18. Hossain, Mahabub. Credit for the Rural Poor, Dhaka : The Bangladesh Institute of Development Studies (May, 1985).
19. Hossain, Mahabub., Green Revolution in Bangladesh, Institute of Development Studies (1987).
20. ILO Publication., Poverty and Landlessness in Rural Asia, Geneva : International Labour Office (1980).
21. MacGregor, Susane. The Politics of Poverty—Politics Today, Longman Group Ltd. (1981).
22. Osmani, S. R., Economic Inequality and Group Welfare, London : Published by Oxford University Press (1982).
23. Prasad, Kamta., Planning for Poverty Alleviation, New Delhi : Agricole Publishing Academy (1985).
24. Punt, A. E., Profiles of Poverty in India, Delhi : B. R. Publishing Corporation (1982).
25. Rakshit, G., Poverty and Planning in India, New Delhi : The World Press Private Ltd. (1977).
26. Rao, T. N., War on Poverty, Delhi : Manas Publications (1986).
27. Ray, J. K., A Study of the Grameen Bank of Bangladesh, Dhaka : The University Press Limited, 114, Motijheel C/A (1987).
28. Sen, Amarty., Poverty and Famines, Delhi, Oxford : University Press (1982).
29. Sen, Amartya., The Political Economy of Hunger, BIDS Public Lecture Series, 3-4 January, 1989.
30. Siddiqui, Kamal. The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh, Dhaka, National Institute of Local Government, Dhaka : Bangladesh, 1982.
31. Singh, Ajit Kumar., Agricultural Development and Rural Poverty (1987), New Delhi : Ashish Publishing House.
32. Verma, M. M. Planning For the Poor, Lajpat Nagar IV, New Delhi : Gitanjali Publishing House (1986).

ARTICLES

1. Osmani, S. R., Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh in Special issue on Poverty in Bangladesh, The Quarterly Journal of BIDS, Vol XVIII, No. 3, Dhaka, 1993.
2. Muhammad Yunus, Planning For the Poor in Alamgir, M. K. & W. Ahmed ed., Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 7, No. 1A, pp. 133-139.
3. হোসেন, মোশাররফ, বাংলাদেশের দারিদ্র : প্রাপ্ত পৃ : ১৪০-১৪৯।
4. Syndicate Paper on Poverty Status in Bangladesh & Planning Strategies for Alleviation of Poverty, Written by Syndicate Group A of 8th Senior Staff Course, BPATC, Savar, Dhaka, 1989.
৫. খান, আকবর আলী, সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ : ৫৮৪-৬০৮।

সরকারী ও বেসরকারী দলিল

- ১। পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ঢাকা : মে, ১৯৮৩, পৃ : ১০১-১১০।
- ২। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ঢাকা : বাংলা সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৬।
- ৩। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দি ফোর্থ-ফাইভ ইয়ার প্লান, ঢাকা : জুন, ১৯৯০।
- ৪। প্রগতি : শিশু রক্ষা ও উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন (১৯৯০-৯৫) জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ইউনিসেফ, ঢাকা : ১৯৯২।
5. Perspectives on Children in South Asia : A Statistical Profile, UNICEF, Kathmundu, Nepal, 1992.
6. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of the Planning, Govt. of People's Republic of Bangladesh : Report of The Child Nutritional Status Survey 1989-90, April, 1991.
7. Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Govt. of People's Republic of Bangladesh : Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1993.